ঝুমুর ও ‘ওরা’

শামস্ রহমান

জীবনে প্রথম যেদিন স্কুলে যাই
বই, স্লেট আর অঙ্কনী -
মা একটা ঝোলা ব্যাগে ভরে
আমাকে ঝুমুরের হাতে তুলে দেয় অসংশয়ে।
ওর হাত ধরে ভিরু পায়ে
কিছুটা পথ চলার পর
পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি
মা তখনও সদর দরজায় দাড়িঁয়ে!

ঝুমুর পাশের বাসার মেয়ে
বয়সে তিন বছরের বড়; তারপরও
ওকে দিদি বলে ডাকতে সংকোচ হতো
ও এত মিষ্টি; কি করে ওকে দিদি বলে ডাকি!
প্রকাশ্যে মনের বিরুদ্ধে
যদিও বা ডেকেছি কালেভদ্রে; বলছি অকপটে -
নি:শব্দে নিজের অজান্তে ওর নামই শুধু
ধ্বনিত হতো হৃদয় পটে।

স্কুল পাঠের দু’বছরের মাথায় এল সেপ্টেম্বর
পয়ষট্রির এ এক অনাড়ম্বর উপাখ্যান -
মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধেই সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল
সমাজ-সংসার অন্তিম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালো
যারা এ বেলা থেকে অন্য বেলার ভাবনায় আবিষ্ট ছিল
স্বনির্ভরতার ধারণা
ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয়গুলি
তাদের চিন্তার জগতে আসন পেল
যারা দেশ ও দশের কথা ভাবতো
তাদের কৌশলে দফায় দফায় কয়েক দফায়
সামনে চলার সিদ্ধান্ত হল।

সেদিন শরতের এক স্বতন্ত্র রূপ -
সূর্য হেলে পশ্চিম দিগন্তে প্রায়
তুলসি গাছের শেষ বিকেলের দীঘল ছায়ায় দাঁড়াতেই
দেখি ঝুমুর-মাসীমা পুজোর ঘরে উপাসনায়
আমাকে দেখেই ডাকে ইশারায় - ‘এখানে আয়’

হামাগুড়ি দিয়ে বসতেই পাশ ফিরে বলে –
ছুটিতে মামার বাড়ি যাব, কলিকাতায়
ফিরতি যাত্রায় তোর জন্য একটা লাটিম নিয়ে আসব -
সৃজনী ঢঙের আর ইঁদ্রধনু রঙের!

যদিও অজানা অচেনা তবুও জাদুময় শোনায়
কলিকাতা যে অদূরে নয় তা বোধদয় হয় -
ভাবি, তালতলার সীমানা ছাড়িয়ে ধলেশ্বরীর ওপারে নিশ্চয়?
সত্যি সত্যিই ওরা একদিন চলে গেল সেপ্টেম্বর-যুদ্ধের পর পর
আর সেই যে গেল ঝুমুর ওর বড়দি অনন্যা কোনদিন ফিরে এলো না।

তিন মাসের মাথায় ঝুমুরদের বাড়িতে আমিন বসে
বাড়ির সামনে সুপ্রসস্থ জমিন -
যেখানে বাদামের আবাদ হত বছরে একাধিক বার
অপার বিচরণ ছিল যেখানে ঝুমুর আর আমার
শোবার ঘর, ঘরের টানা বারান্দা
পিছনের দুব্বাহীন উঠান
ডান ধারে
তুলসি পাড়ে পুজার ঘর
একচালায় হরলিক্স কৌটার কাশন্দি আর
টান টান বিছানো কাঁচা-মিঠার সত্ব
বেলা শেষ না হতে এসব তিন ভাগে ভাগ হয় আমিনের লম্বা রশিতে।

ঝুমুরের কর্তৃত্ব থেকে অসময়োচিত মুক্তি
মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না
বিশ্বভুবনে ও নিশ্চয়ই কোথাও আছে নিশ্চিত নিরাপদে
সে আবেগে অন্তরে খুঁজেছি নিরন্তর শান্তনা।

ঝুমুরের অবর্তমানে এক সহপাঠি - নাম অমিত
অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে ওঠে প্রাণের সখা
স্কুলের পথেই ওদের বাসা
অমিতের বাসা হয়েই শুরু হয় ঝুমুরবিহীন যাওয়া-আসা
ক্রমশ অমিত-স্কুল-বাসা ঘিরে সৃষ্ট অয়ন
রূপ নেয় নিত্যদিনের প্রত্যাশায়
ওদের বাড়ির সদর দরজা ভেংগে ঢুকতেই
শুনতে পেতাম মাসীমার উৎকণ্ঠ কন্ঠ –
'কোথায়, শীঘ্রি পুজার ঘরে আয়'
আর আমার পদধ্বনি পেলেই –
এই খোকা, এখানে আস, পেন্নাম কর!
মা স্বরসতীকে প্রণাম করেই স্কুলের পথে দুজনের সে কি ছুট –
পাড় হয়ে গোল্লাছুটের মাঠ, সড়ক, মহাসড়ক, বড় পুকুরের ঘাট!
আর জীবনের অনেকটা সময় পেড়িয়ে বুঝেছি –
সেটাই ছিল আমার সেকুলারিজমের প্রথম পাঠ।

এভাবে তৃতীয় থেকে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণী .....
আসে মার্চ
প্রত্যাশার চিত্তে শুনি ধ্বংসের ধ্বনি
শহর তখনও মুক্ত
তবে অদূরেই তাবু, জলদস্যু সদৃশ জোয়ান
সঙ্গে জলপাই রঙের যান
আক্রমণ যে আসন্ন
তাতে দশের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল বটে, তবে
ঘটে মধ্যরাতের নিস্তব্দতা ভেঙ্গে
অন্তহীন বর্বরতা, নৃশংসতা আর অনিশ্চয়তার মাঝে
মানব স্রোত ছুটে অবিদিত নিশ্চিত নিরাপত্তার খোঁজে -
গ্রামে, সংগ্রামে
সীমান্তে, কৌশলী অবস্থানে
ভিরে, শরনার্থী শিবিরে –
কাটে ন'মাস।

তারপর লাল-সবুজে রাঙিয়ে
রাঙা প্রভাতে ভাঙা উঠানে প্রত্যাবর্তন
নিয়ন্ত্রণের ব্যাসার্ধ ছাড়িয়ে খুঁজেছি তাকে প্রত্যন্ত প্রান্তে -
অগণন ব্যথিতদের মাঝে
প্রত্যাবর্তনকারীদের ভিরে
খুঁজেছি ডিসেম্বরে বিজয়ের পতাকা তলে
তেরানব্বই হাজার 'মাথা নত-করা'র মহা আয়োজনে
খুঁজেছি দেবতার বিসর্জনে
কোথাও তার দেখা মেলেনি
ঝুমুরের মত অমিতও আর কখনো ফিরেনি।

কলঙ্কময় অগাস্টের পর
ফাঁকা করে শহর বন্দর
ফসলের মাঠ
শাড়ির আড়ত, তাঁতের কারখানা
নাম না জানা শত সহস্র 'ওরা'
নিত্য হয়েছে দেশান্তর অগণিত হারে।

ঝুমুররা আজও যায়
আজও যেতে হয় ওদের
শতাব্দির পূর্বপুরুষের উঠান ছেড়ে নিশ্চিন্তের সন্ধ্যানে অনিশ্চিত দুয়ারে।

---

২৯ অক্টোবর, মেলবর্ণ